ওহাবী-নজদীদের ইতিকথা

আবু ফাতেমা মুহাম্মদ ইসহাক

"সউদ" ছিলেন একজন আরবীয় আমীর। তাঁর পিতার নাম ছিল "মিক্‌রিম"। ১৭২০ সনে এই "সউদ ইবনে মিক্‌রিম" আরব উপ-সাগরীয় এক ক্ষুদ্র অঞ্চলের আমীর হন। পূর্ব পুরুষেরা উপ-সাগরীয় উপকূলের দারিয়া গ্রামাঞ্চলে প্রথম বসতি স্থাপন করেন। তারপর ১৪৪৬ সনে এরা "ওয়াদি হানিফা" অঞ্চলেও এসে বসতি বিস্তার করেন। 'সউদ ইবনে মিক্‌রিম' এই দুই অঞ্চলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ১৭২০ সনে। তাঁর পুত্র মুহাম্মদ ১৭২৬ সনে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। তখন থেকে তিনি "মুহাম্মদ ইবনে সউদ" নামে এই নব-প্রতিষ্ঠিত আমিরাতের আমীর রূপে সর্বত্র স্বীকৃতি লাভ করেন।

অপর দিকে আরবের 'উয়াইনা' অঞ্চলে "তামিম গোত্রের" একটি শাখা বনু সিনান ১১১৫ হিজরীতে বসতি বিস্তার করেছিল। এই বনু সিনান বংশীয় আবদুল ওহহাবের ঔরসে এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে ১৭০৩ সনে। তাঁর নাম রাখা হয় মুহাম্মদ। এই মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহ্‌হাব মদীণায় শিক্ষা লাভ করেন। মদীণায় তাঁর উস্তাদ ছিলেন হযরত মাওলানা সুলায়মান আল-কুর্দী ও হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হায়াত আল সিন্ধী। তাঁদের কাছে অধ্যয়নকালেই মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহ্‌হাব তাঁর অধর্মীয় মন-মানসিকতার পরিচয় প্রদান করেন। এই দু'জন শিক্ষকই তাঁর অধর্মীয় মনোবৃত্তির জন্য দুঃখিত ছিলেন এবং তাঁর প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন।

মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহ্‌হাব জীবনের অধিকাংশ সময়ই বিভিন্ন এলাকায় ঘুরাফিরা করে কাটিয়েছেন। শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি প্রথমে বসরার কাজী হোসেনের গৃহে গৃহ-শিক্ষকরূপে চার বছর কাটান। তারপর পাঁচ বছর কাটান বাগদাদে। সেখানে তিনি এক বিত্তশালিনী মহিলাকে বিবাহ করেন। এই মহিলা ছিলেন বিধবা। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি চলে যান কুর্দীস্থানে। সেখানে তিনি এক বছর অবস্থান করেন। এরপর সেখান থেকে চলে আসেন 'হামাদানে'। হামাদানে তিনি দু'বছর বসবাস করেন। হামাদান থেকে পরে চলে যান ইস্‌পাহানে। তখন সে অঞ্চলে নাদিরশাহের শাসন চলছিল। এখানে থেকে তিনি এরিস্টটলের দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। চার বছর তিনি এ স্থানে অবস্থান করেন। তারপর 'কুম' শহরে গমণ করেন এবং হাম্বলী মযহাবের একজন খাঁটি ভক্ত সাজেন। পরি-শেষে নিজ জন্মভূমিতে ফিরে আসেন এবং তাঁর ধর্মীয় মতবাদ প্রচার শুরু করেন। কিছু কিছু করে তাঁর মতাদর্শে লোকদেরকে দীক্ষা দিতে থাকেন। তখন তাঁর মতের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড

আন্দোলন সৃষ্টি হয়। তাঁর সহোদর ভাই সুলায়মান তাঁর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন পরিচালনা করেন এবং তাঁর মতবাদের বিরুদ্ধে একটি পুস্তক রচনা করে জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করেন। তাকে কেন্দ্র করে তাঁর নিজ এলাকায় রক্তপাত ও বিবাদ-বিসংবাদ শুরু হয়। তখন "উয়াইনা" অঞ্চলের শাসন কর্তা তাঁকে বহিষ্কার করেন। নিরুপায় হয়ে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব তাঁর নিজ অঞ্চল 'উয়াইনা' ছেড়ে দিয়ে আরব উপসাগরীয় উপকূলের দারিয়া পল্লীতে এসে উপস্থিত হন। দারিয়া এলাকার আমীর মুহাম্মদ ইবনে সউদ তাঁর সঙ্গে চুক্তি বদ্ধ হয়ে তাঁর আমিরাতে তাঁকে অর্থাৎ মুহাম্মদ ইবনে অবেদুল ওহাবকে আশ্রয় দান করেন।

তখনও মুসলিম উম্মার ক্ষীণতম অবলম্বন তুর্কী খলিফা কর্তৃক পরিচালিত খিলাফত বিদ্যমান ছিল। খিলাফত দুর্বল অবস্থায় থাকলেও সে যুগের পরাশক্তি বৃটিশ এই খিলাফতকে ভয় করে চলতো। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল: এই দুর্বল রুগ্ন খিলাফতকে ভেঙ্গে দিয়ে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করে মুসলিম দুনিয়াকে শতধা বিভক্ত করা। এরূপ করতে পারলেই মুসলিম জগতের উপর তাঁদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা সহজ সাধ্য হয়ে উঠবে। আরব জগতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা বাদশার জন্ম দিতে পারলেই বৃটিশ রাজশক্তির স্বার্থ সিদ্ধ হবে। ইংরেজ গোয়েন্দারা মুসলমান হয়ে মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আরবী ফার্সী ভাষায় শিক্ষিত হয়ে কোরান হাদীস ফিকাহ্, তাফসীর পাঠ করে সনদলাভে সমর্থ হতো। তারপর ধর্মীয় নানা খুঁটিনাটি বিষয়ক আলোচনায় বিভিন্ন মত পার্থক্য সৃষ্টি করে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ দলাদলি সৃষ্টি করাতে তৎপর থাকতো। ইংরেজ গোয়েন্দারা "যখন যেমন, তখন তেমন" রূপধারণ করে কাজ করে যেতো। গোয়েন্দা স্মারক মাধ্যমে' জানা যায় মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব ও মুহাম্মদ ইবনে সউদের কাঁধে ভর করেছিলো বৃটিশ গোয়েন্দা বাহিনীর লোকেরা। এদের তৎপরতায়ই মুহাম্মদ ইবনে সউদ ও মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব লক্ষ্য অর্জনে পরস্পর চুক্তিবদ্ধ হন। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব সপরিবারে মুহাম্মদ ইবনে সউদের আশ্রয় নিয়েছিলেন। ইবনে ওহাব ইবনে সউদের নিকট তাঁর মেয়েকে বিবাহ দিলেন। চুক্তি হল: উভয়ে সম্মিলিত ভাবে তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাবেন। যুদ্ধ করে খিলাফত ভেঙ্গে দিয়ে তুর্কী শাসন কর্তাদের আরব উপদ্বীপ থেকে বিতাড়িত করতে পারলে মুহাম্মদ ইবনে সউদকে আরব ভূমির বাদশাহরূপে স্বীকৃতি দিতে হবে। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব তাতে রাযী হলেন। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবের মতাদর্শে দীক্ষা নিলেন। এ দীক্ষার সঙ্গে

আগ্নেয়াস্ত্র শিক্ষার মহড়াও চল্‌লো। এর সময়কাল ছিল ইং ১৭৪৫ সাল। এর দু'বছর পর ১৭৪৭ ইং সনেই "নজদ" এর শাইখের সঙ্গে হবনে সউদের ও ইবনে ওহাবের সম্মিলিত বাহিনীর সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেলো। এই সংঘর্ষ চলেছিল বহু বৎসর ধরে। ১৭৬৪ সনে মুহাম্মদ ইবনে সউদ মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর পুত্র আবদুল আজিজ ইবনে মুহাম্মদ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন ইং ১৭৬৫ সনে আবদুল আজিজ ইবনে মুহাম্মদ সমগ্র নজদ প্রদেশ ও এর রাজধানী শহর রিয়াদ দখল করে নেন।

১৭৬৬ সালে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহ্‌হাব মক্কার শাসনকর্তার কাছে তাঁর মতাদর্শ গ্রহণ ও প্রচার করার জন্য একজন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। মক্কার শাসনকর্তা ইবনে ওহ্‌হাবের মতবাদ হাম্বলী মজহাবের অনুসারী ভেবে মক্কায় তা প্রচারের ব্যবস্থা করেন। অতি দ্রুততার সঙ্গে ইবনে ওহ্‌হাবের মতাদর্শের প্রচারণা এক রাজনীতিক রূপ গ্রহণ করে এবং এ মতাদর্শের বিস্তৃতিও দ্রুতগতিতে চলে।

কিন্তু ১৭৭৩ সনে নজদের রাজধানী শহর রিয়াদের শাসনকর্তা দাহ্‌হাম আবার ইবনে ওহ্‌হাবের মতবাদের তীব্র সমালোচনা শুরু করেন। তা দেখে আবদুল আজিজ ইবনে মুহাম্মদ আস্ সউদ দাহ্‌হামকে দমন করতে এগিয়ে আসেন। দাহ্‌হাম আবদুল আজিজ আস সউদের মুকাবিলা না করে পলায়ন করেন। এরই ফলে দলে দলে নজদ প্রদেশের বেদুইনরা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহ্‌হাবের মতবাদ গ্রহণ করতে শুরু করেন। ইবনে আবদুল ওহ্‌হাব তাঁর মতবাদকে কেন্দ্র করে কিতাব আত্‌তওহীদ নামীয় একটি গ্রন্থ রচনা করেন। যুদ্ধ করে করে সমগ্র নজদ ভূমিতে আবদুল আজিজ আস সউদ তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেন। উত্তরে কাছিম, দক্ষিণে খরজ ভূমি পর্যন্ত মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবের ধর্মীয় মতবাদও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এভাবেই দারিয়া, উয়াইজা ও নজ্‌দ ভূমিতে এবং মক্কা অঞ্চলেও নিজ মতাদর্শ প্রচার করে ১৭৮৭ সনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পরও আবদুল আজিজ আস্ সউদ তাঁর মতবাদ জোরে-শোরে আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচারের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পিতার সুযোগ্য পুত্র ছিলেন। অধিকন্তু, বৃটিশ রাজশক্তি ও বৃটিশ মুদ্রা আবদুল আজিজ আস সউদের শক্তি বৃদ্ধিতে ও অভিযান পরিচালনায় যথেষ্ট সাহায্য করে। আবদুল আজিজ আস্ সউদ ১৭৯১ সনে মক্কায় হামলা চালায়। ইরাকের নানা স্থানেও অভিযান চালাতে থাকেন। ১৭৯৭ সনে বাগদাদের পাশা এসব অভিযান প্রতিরোধকল্পে তুর্কী খলিফার নির্দেশ লাভ করেন। কিন্তু প্রতিরোধ করতে গিয়ে লাঞ্ছিত হন। ১৮০৩ সনে মক্কার শাসনকর্তা

গালিব আবদুল আজিজ আস্ সউদের আক্রমণ প্রতিহত করতে না পেরে মক্কা থেকে পালিয়ে যান। তখন সউদ বাহিনী সদলবলে মক্কায় প্রবেশ করে। অবশ্য দ্বিতীয় পর্যায়ে সউদ বাহিনীকে তুর্কী খলিফার বাহিনী সাময়িকভাবে হলেও মক্কা থেকে বের করে দিতে সক্ষম হয়। কিন্তু সউদ বাদশা আবদুল আজিজ আস্ সউদ নূতন উদ্যম নিয়ে বিপুল বিক্রমে হেজাজ ভূমি আক্রমণ করেন এবং ১৮০৪ সনে মদিনা, ১৮০৬ সনে মক্কা ও কিছুকাল পরে জেদ্দা সম্পূর্ণভাবে অধিকার করে নেন। পরবর্তী পাঁচ বছর কাল মধ্যে আরব উপদ্বীপের সম্পূর্ণটাই তাঁর অধিকারে চলে আসে। আবদুল আজিজ আস্ সউদের সুদক্ষ পরিচালনায় ১৮১১ সনের মধ্যেই ওহাবী প্রভাব ও প্রতিপত্তি আলেপ্পো থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত এবং পারস্য উপসাগর হতে ইরাক সীমান্তের পরবর্তী পূর্ব-লোহিত সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে।

তখন থেকেই সউদ রাজের বেদুইন বাহিনীর কার্য কলাপ ও অধর্মীয় আচার আচরণের বিরুদ্ধে মুসলিম জগতের সর্বত্র এক ভীষণ আন্দোলন শুরু হয়। কারণ ওহাবী মন্ত্রে দীক্ষিত সেনাবাহিনীর লোকেরা মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যা শুরু করে, মুসলমানদের পবিত্র স্থান সমূহ ধূলিস্যাৎ করতে থাকে।

ওহাবী মতাবলম্বী সেনাবাহিনী ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের পরামর্শে ও সহযোগিতায় ১৮০১ সনে কারবালা অধিকার করে এবং হযরত ইমাম হোসাইনের রওজা ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। তারপর ১৮০৩/১৮০৪ সনে মক্কা মদিনায় প্রবেশ করে যত বুজুর্গ সাহাবার রওজা মোবারক ছিল সব ভেঙ্গে একাকার করে দেয়। মদিনাতে হযরত ওসমান, হযরত হাসান, হযরত আয়শা, হযরত ফাতিমা, হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন, হযরত ইমাম বাকের, হযরত ইমাম জাফর আস্সাদিক ও আরো অন্যান্য সাহাবা-কেরামের কবর ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। জঙ্গে ওহুদের শহীদানদের রওজাগুলোও ভেঙ্গে ফেলে। অথচ রাসুলুল্লাহর (দঃ), সাহাবী, তাবেঈন ও তাবে তাবেঈনদের যুগেও এসব রওজা শরীফ বিদ্যমান ছিল, সম্মানিত স্থান হিসাবে সর্বত্র সমাদৃত ছিল।

ওহাবী বলা হয় তাদেরকে যারা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবের মতবাদ বিশ্বাস করে এবং তদানুসারে কাজও করে। ইবনে আবদুল ওহাব যে সব কথা বলে গেছেন তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে: ক) ইবাদত-কালে নবী, ওলী, ফিরিশতাদের নাম গ্রহণ করে প্রার্থনা করা 'শিরক' কিংবা বহু দেবার্চনার মতই নিন্দনীয়। খ) যে সব লোক ওলীদের মাজারে গমন করে ও তাঁদের ওছিলা দিয়ে প্রার্থনা করে কিংবা তাদের আশিস প্রার্থনা করে তাঁদের এসব কাজ বা আচরণ কুরআনে

বর্ণীত মক্কার মুশরেকীনদের কার্যের অনুরূপ। এজন্য নবী রাসুল, বুজুর্গ, সাহাবা-ই-কেরামদের স্মৃতিসৌধ, রওজা মোবারক ইত্যাদী ধ্বংস করার নির্দেশ ওহাবীরা দিয়ে থাকেন। ওলিআল্লাহ ও সুফীতাপসদের, শহীদ্দের রওজাপাক সমূহও এরা ধ্বংস করেছেন। শুধু তাই নয়, ইবনে আবদুল ওহাব মিলাদুন্নবীর জন সমাবেশ, সীরাতুন্নবীর প্রচলিত আলোচনা উৎসবও বন্ধ করে দেন।' গ) তাঁদের মতে কুরআনের তা'বিল বা উপাদানগত ব্যাখ্যা দান ধর্মবিরুদ্ধতা। ঘ) তাঁরা বলেন: তসবিহ গণনা বিদ-আত, কারণ এ আচরণটি তাদের মতে বৌদ্ধদের নিকট থেকে গৃহীত। ঙ) এঁরা আরও বলেন: ঐতিহাসিক স্থান সমূহ দর্শন করার লক্ষ্যে সেগুলোতে গমনাগমন বিদ্আত। চ) এঁদের মতে সুফীদের ধ্যানমগ্নতাও নিষিদ্ধ। ছ) এবং গার-ই-হেরা বা জবল-ই-নুর দর্শনের জন্য গমন করাও বিদ্আত। জ) ওহাবীরা আরও প্রচার করেন: কারো মধ্যবর্তিতায় আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ শিরক। অর্থাৎ সুফী-পীরদের ওসিলা বা মধ্যবর্তিতা গ্রহণ করে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের সাধনা শিরক করা বৈ আর কিছু নয়। ঝ) এরা কুরআন; হাদিস এবং যুক্তির সহজ ও অবশ্যম্ভাবী নির্দেশ ছাড়া অন্য জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণকে কুফরী কর্ম বলেন। ঞ) কোন স্মরণীয় ও বরণীয় মহাপুরুষের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত বৃক্ষপত্রাদি, স্থানাদি কিংবা তাঁদের সৌধ মালায় গমন করে তথায় পুষ্প অর্পণ কিংবা সম্মান প্রদর্শনার্থে কোন কিছু করণ কিংবা ওরস অনুষ্ঠানের আয়োজন করণ ইত্যাদি কর্মপ্রবাহ ওহাবী নেতারা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এসব কর্ম প্রবাহকে এরা কবর পূজা বলে থাকেন। তাদের মতে, এসব রীতি-রেওয়াজ প্যাগান রীতির অনুসরণ মাত্র। ওহাবীদের এসব মতামতের বিরুদ্ধে মুসলিম জগত রোষে ও ক্ষোভে ফেটে পড়ে।

তুরস্কের সুলতান বিপুল প্রস্তুতি নিয়ে ওহাবীদের দমন করার লক্ষ্যে অগ্রসর হন। সমস্ত মুসলিম দুনিয়া সুলতানের পশ্চাতে এসে দাঁড়াল। মিশরের পাশা মুহাম্মদ আলীর উপর ওহাবীদের ধ্বংস করার দায়িত্ব অর্পিত হল। তিনি এক সুসজ্জিত ও সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী তাঁর পুত্র তুসুনের নেতৃত্বে হেজাজে প্রেরণ করলেন। এই বাহিনী ১৮১২ সনে মদিনা ও ১৮১৩ সনে মক্কা অধিকার করে নিল। ১৮১৩ সনে মিশরের পাশা মুহাম্মদ আলী নিজেই সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৮১৪ সনে নজদ-অধিপতি আবদুল আজিজ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সউদ মৃত্যু বরণ করেন। তিনি আবদুল আজিজ আস সউদ নামেও পরিচিত। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ্ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। আবদুল্লাহ্ তাঁর পিতা আবদুল আজিজ আস্ সউদের মতো সাহসী বীর ছিলেন না। তিনি মিশর বাহিনীর

সঙ্গে যুদ্ধ না করে সন্ধি করেন। সন্ধির শর্ত অনুসারে তিনি তুর্কী খলিফার বশ্যতা স্বীকার করেন। ১৮১৬ সনে মিশরের পাশা মুহাম্মদ আলী পুনরায় নজদ আক্রমণ করেন এবং নজদের বাদশাহ আবদুল্লাহকে বন্দী করে কনস্ট্যান্টিনোপলে প্রেরণ করেন। এদিকে মুহাম্মদ আলী ইব্রাহিম পাশাকে নজদের রাজধানী "দারিয়া" ধ্বংস করার নির্দেশ দেন। মুহাম্মদ আলী পাশার নির্দেশে ইব্রাহিম পাশা রাজধানী দারিয়া শহরকে ধূলিস্যাৎ করে দেন। আর কনস্ট্যান্টিনোপলে নজদ অধিপতি আবদুল্লাহকে সাধারণ কয়েদীর মতো রাখা হয়। অতঃপর তাঁর শিরোচ্ছেদ করা হয়। "ওহাবী আন্দোলন" গ্রন্থের লেখক আবদুল মওদুদ বলেন: "আরবের মরীচিকার মতোই সহসা চক্ষু ঝলসিয়ে দিয়ে ওহাবীদের বিশাল সাম্রাজ্য ও ক্ষাত্রশক্তি কোথায় মিলিয়ে গেল তার কোন অস্তিত্বই রইলনা।" এই লেখক ওহাবীদের প্রতি যে খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন, তাঁর "ওহাবী আন্দোলন" বইয়ের "ওহাবী আন্দোলনের রূপরেখা" অধ্যায়টি পাঠ করলেই পাঠক তা বুঝতে পারবেন।

আরব জগতে খিলাফত আবার প্রতিষ্ঠিত হলো। কিন্তু বৃটিশ কূটনীতিবিদ্‌রা খিলাফত ভেঙ্গে যে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ কিংবা ভৌগলিক জাতীয়তাবাদের মন্ত্র আরবদের শিক্ষা দিয়েছিলেন, তা সাময়িকভাবে স্তিমিত থাকলেও আরব আমীরদের কারো কারো মনে গুমরে ফিরছিল। তুর্কী খলিফা কর্তৃক পরিচালিত খিলাফতকে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব ও মুহাম্মদ ইবনে সউদ, "সাম্রাজ্যবাদী শাসন ব্যবস্থা" আখ্যায় আখ্যায়িত করে গোপনে খিলাফত-এর বিরুদ্ধে আরবদের মনে ঘৃণা ও বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্জ্বলিত করে রেখে গেছিলেন। ওহাবী মতাবলম্বী নিজেদের বেদুঈনগোষ্ঠী এবং সউদ বংশীয় নজদী শেখদের মনে এই ঘৃণা ও বিদ্বেষবহ্নি পরবর্তী শতাব্দী কাল ব্যাপী ছিল অনির্বাণ। গোপনে গোপনে এঁরা শক্তি সঞ্চয় করছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে সউদের বংশে ১৮৮০ সনে আবদুল আজিজ আস সউদের মতো আবদুল আজিজ ইবনে আবদুর রহমান নামীয় এক বীর পুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি তার পূর্ব পুরুষ আবদুল আজিজ আস্ সউদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজ্য পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখছিলেন। তাঁকে তাঁর স্ববংশীয়রা আবদুল আজিজ ইবনে সউদ নামে সুপরিচিত করে তুলছিল। আবদুল আজিজ ইবনে আবদুর রহমান হয়ে গেলেন আবদুল আজিজ ইবনে সউদ। সর্বত্র এ নামেই তাঁর হাঁকডাক শুরু হলো।

এ সময়ে হেজাজে তুর্কী সুলতান কর্তৃক নিয়োজিত গভর্ণর ছিলেন মক্কার শরীফ হোসাইন এবং নজদে ছিলেন ইবনে রশীদ। উভয়েই তুর্কী খলিফার পরামর্শে শাসন কার্য

পরিচালনা করতেন। ১৯০৪ সনে আবদুল আজিজ ইবনে সউদ কুয়েত থেকে এক আতর্কিত আক্রমণ পরিচালনা করেন নজদ প্রদেশে এবং নজদ এর রাজধানী শহর রিয়াদ দখল করে নেন। ক্রমাগত যুদ্ধ বিগ্রহ চললো। ১৯১২ সনে আবদুল আজিজ ইবনে সউদ সমগ্র নজদ অঞ্চলে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। এর পরই প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। ১৯১৪ সন থেকে ১৯১৮ সন পর্যন্ত এই মহাসমর স্থায়ী ছিল। ব্রিটিশ কূটনীতিকরা মক্কার শরীফ হোসাইনকে বিদ্রোহ ঘোষণা করার জন্য কুপরামর্শ দিতে লাগলো। ইংরেজদের কুপরামর্শে শরীফ হোসাইন বিশ্বাস ঘাতকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তারপর ১৯২৪ সনে নিজকে খলিফা ঘোষণা দিয়ে বসেন। এদিকে আবদুল আজিজ ইবনে সউদ ১৯২১ সনে নজদ থেকে তুর্কী খলিফার প্রতিনিধি ইবনে রশীদকে সবংশে উৎখাত করেছিলেন। এরপর ১৯২৬ সনে মক্কার শরীফ হোসাইনকে সম্পূর্ণ ভাবে যুদ্ধে পরাস্ত করে হেজাজ রাজ্য দখল করে নেন। ১৯৩২ সনের মধ্যে তিনি তাঁর অধিকৃত স্থান সমূহের একত্রে নাম রাখেন "সউদী আরব"। এটিই আরবদের বর্তমান জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। ১৯৫৩ সনে আবদুল আজিজ ইবনে সউদ মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সউদ ইবনে আবদুল আজিজ ক্ষমতা গ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সন থেকে ১৯৬৪ সন পর্যন্ত তিনি সউদী আরবে বাদশাহী করেন। ১৯৬৪ সনের নভেম্বর মাসে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। সউদ ইবনে আবদুল আজিজের স্থলে ফয়সলকে রাজতক্তে বসানো হয়। ১৯৭৫ সনে বাদশাহ ফয়সল আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। তাঁর স্থলে তাঁর ভ্রাতা খালেদ রাজ সিংহাসনে বসেন। বর্তমানে বাদশাহ ফাহাদ সৌদী আরবের সিংহাসনে আসীন।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় যে, তুর্কী খিলাফত ভেঙ্গে দিয়ে আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে সৃষ্ট হয়েছে সৌদী আরব, মিশর, জর্ডান, ইরাক, সিরিয়া প্রভৃতি কতিপয় রাজকীয় রাষ্ট্র। এসব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল ইংরেজ গোয়েন্দাদের সহযোগিতায় মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবের গোপন উদ্দেশ্য হাসিলের তৎপরতা এবং আবদুল আজিজ আস সউদের বাদশাহ হবার তীব্র আকাঙ্খা। আরব জাতীয়তাবাদের প্রকাশ্য জন্মদাতা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব আর খিলাফত ধ্বংসের মূলে ব্রিটিশ কূটনীতিবিদরা উগ্র নজদী বেদুইনরা এদের সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে এদের সফলতা ত্বরান্বিত করেছে। উল্লেখ্য যে, হেজাজ থেকে ইয়েমেন স্বতন্ত্র, আমির প্রদেশও স্বতন্ত্র।

মুসলিম দুনিয়ার খিলাফত ভেঙ্গে আরব জগতে বহু রাজা বাদশাহ সৃষ্টি করে রাজতন্ত্র কায়েম

করা হয়েছে। খিলাফতের স্থলে রাজতন্ত্র কায়েম যে জঘন্য বিদআর্ত—একথা ওহাবী আলেমগণ স্বীকার করেন না। আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ (দঃ) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন খিলাফত। আর এই খিলাফত ভেঙ্গে যাঁরা যুগে যুগে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেন, তাঁরা যে ঘৃণ্য বিদ্‌আতের সৃষ্টি করলেন, এদিকে কারো দৃষ্টি পড়লোনা। ওহাবী গুরু ইমাম ইবনে তাইমিয়ার দৃষ্টিতেও এই রাজতন্ত্র রূপ প্রধান বিদ্‌আতের কথা ধরা পড়লো না। তাঁর চোখে ধরা পড়লো শুধু তাওয়াস্‌সুল বা ওসিলা ধরা বিদআত, পীরের কাছে বাইয়্যাত গ্রহণ করা বিদ্‌আত, সুফী তাপসদের ধ্যান মগ্নতা বিদআত, নবী-রসুল সাহাবা-ই-কেরাম, শহীদান ও মোশায়েখগণের রওজা শরীফ জিয়ারত করা বিদ্‌আত। ১২৬৩ সন থেকে ১৩২৮ সন পর্যন্ত ইবনে তাইমিয়া "শাদিদ রিহালের হাদীসের অপব্যাখ্যা দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে ফেৎনার সূচনা করেন। ওহাবী নজদীরা তাঁর ভ্রান্তমত অনুসরণ করে এই ফেৎনা ফাসাদের মাত্রা বৃদ্ধি করে চলে। আহলে সুন্নতপন্থী আলেমগণ ইবনে তাইমিয়ার মতবাদ কোরআন হাদীসের আলোকে বাতিল ঘোষণা করেন তা সত্ত্বেও তাঁর অনুসারী ওহাবী নজদীগণ পুনরায় পরবর্তীকালে এ নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করে, খুন ফ্যাসাদে জড়িত হয়। মক্কা মদীনায় বলপূর্বক চেপে বসে। হেরেম শরীফে রক্তপাত ঘটায়। মক্কা মদীনায় চেপে বসেই এঁরা ঘোষণা করেঃ নবী করীম (সাঃ) এর রওজা পাক জিয়ারতের নিয়তে মদীনায় গমণ বিদ্‌আত। এর নাম দেয় এঁরা কবর পূজা। নবীজীর রওজায় জিয়ারত উদ্দেশ্যে গমণ করা ওহাবীদের মতে হারাম আর সুন্নীদের মতে রওজা মোবারক জিয়ারত করার নিয়তে মদীনা শরীফ গমণ করা অতি উত্তম কাজ। এ মহৎ ও পুণ্যের কর্মটি ওয়াজিবের কাছাকাছি বলে সুন্নী মুসলমানগণ মনে করেন। ওহাবীগণ রওজা পাকে আল্লাহর রাসুল জীবিত আছেন, এ কথা কখনো বিশ্বাস করেনা। কিন্তু সুন্নীগণ তা বিশ্বাস করেন। ওহাবীরা নবী-রসুল, অলিআল্লাহ গাউস কুতুবের ওসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা হারাম বলে থাকে; আর সুন্নী মুসলমানগণ ওসিলা দিয়ে আল্লাহর কাছে মোনাজাত করাকে মোনাজাত কবুলের সহায়ক মনে করেন। ওহাবীরা মিলাদ অনুষ্ঠান করে না। মিলাদ অনুষ্ঠানকে তাঁরা বিদআত বলে থাকে। আর সুন্নাত অল জামাত পন্থীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে মিলাদ অনুষ্ঠান করে থাকে। ওহাবীরা পীর আউলিয়া, গউস কুতুব, নবী রসুল, সাহাবা-ই-কেরাম ও শহীদগণের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দোওয়া দরূদ পাঠ করা হারাম বলে থাকে, আর সুন্নীরা এসব শ্রদ্ধার সঙ্গে করে থাকেন এবং এসব করাকে জায়েজ বলে প্রচার করে

থাকেন। ওহাবীরা নবী করীম (দঃ) এর শানে অনেক সময়ই আদবের খেলাপ মন্তব্য করে বসে; কিন্তু সুন্নীরা তা কখনো করেন না, তারা আল্লাহর রাসুলের শানে বেয়াদবীসূচক উক্তি করাকে কুফরী বলে থাকেন। ওহাবীরা পীর মুর্শিদের কাছে বাইয়্যাত হওয়া, তরিকত ও তাসাউফের অনুসারী হওয়া, মুরাকাবা মোশাহেদায় নিমগ্ন হওয়া, হালকায়ে জিকির করা ইত্যাদিকে অবৈধ বলে প্রচার করে থাকেন; কিন্তু সুন্নীগণ পীর মুর্শিদকে শ্রদ্ধা করেন, তাঁদের কাছে বাইয়্যাত হন, মোরাকাবা মোশাহেদা করেন, জিকির আজকার করেন, তরিকত তাসাউফের চর্চা করে থাকেন। ওয়াবীগণ তাকলীদ করাকে না জায়েজ বলে থাকে, আর সুন্নীরা তাকলীদ করাকে জায়েজ বলে থাকেন। আর মূর্খ অজ্ঞদের জন্য তাকলীদ করা ওয়াজিব বলে থাকেন। ওহাবীরা হযরত জুনাইদ বোগদাদী, হযরত সাররি সাকতি, হযরত ইব্রাহিম ইবনে আদহাম, হযরত খাজা মুঈনউদ্দিন চিশতি, হযরত খাজা বাহাউদ্দিন নকশেবন্দী গউসুল আজম হযরত আবদুল কাদের জিলানী শেখ আকবর হযরত মুহীউদ্দিন ইবনুল আরাবী হযরত আবদুল ওহাব শা-রানী প্রমুখ তরিকতের মশায়েখদেরকে অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ করে থাকেন, পক্ষান্তরে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত পন্থী মুসলমানেরা তাঁদের ওসিলা করে মোনাজাত করে থাকেন, তাদের রূহর উপর দোওয়া দরূদ পাঠ করে থাকেন। তাঁদের কবর জিয়ারতে গমন করে থাকেন। নবী রসুলদের স্মৃতি বিজড়িত বিশিষ্ট বিশিষ্ট স্থান, গুহা পাহাড় পর্বত উপত্যকা প্রভৃতি পরিদর্শন করার উদ্দেশ্যে গমন ওহাবীদের মতে বিদআত। কিন্তু সুন্নাত অলজামাতের লোকেরা এসব স্থান পরিদর্শন করাকে পুন্যময় ও বরকতময় মনে করেন।

ওহাবীরা এই ধরণের মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে আরব জগতের মুসলমানদের মধ্যে ফেৎনা ফ্যাসাদের সৃষ্টি করেছে। মুসলমানকে হত্যা করেছে, তাদের ধনসম্পদ লুটপাট করেছে মক্কার হেরেম শরীফ মুসলমানের রক্তে রঞ্জিত করেছে। মুসলমানদের খিলাফৎ ব্রিটিশ কূটনীতি বিদদের পরামর্শে ও সহযোগিতায় বিলুপ্ত করেছে। আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করে এক খলিফার স্থলে বহু রাজা বাদশার জন্ম দিয়ে খিলাফতেকে বহু আঞ্চলিক রাজ্যে বিভক্ত করেছে। এর ফলে মুসলমানদের চরম দুর্যোগের সময়েও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুসলিম রাজ্যের রাজা বাদশাগণ এক হতে পারছেন না। পরস্পর বিচ্ছিন্ন থেকে মুসলমানদের সর্বনাশ করছেন। অমুসলমান পরাশক্তি কয়টির লেজুর বৃত্তি করে স্বজাতি ও স্বধর্মের সমূহ ক্ষতি করে যাচ্ছেন। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের মন্ত্র দিয়ে বিরাট মুসলিম জাহানকে খণ্ড বিখণ্ড করে মুসলিম

জাতির দুর্ভাগ্য ডেকে এনেছেন। চতুর্দশ শতাব্দীর ইবনে তাইমিয়া ও তাঁর ভাবশিষ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব মুসলিম দুনিয়ার কী সর্বনাশ করে গেছেন আজকের বুদ্ধিজীবীরা একটু ভেবে দেখুন।

সাহায্যকারী গ্রন্থ সমূহ ঃ

১। ওহাবী আন্দোলন ঃ
আবদুল মওদুদ।
২। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে হজ্ব ও কাবা ঃ
মাওলানা মোঃ ছামির উদ্দিন।
৩। মুসলিম জাহান ঃ
সোহরাব উদ্দিন আহমেদ।
৪। ইসলামের ইতিহাস ঃ
অধ্যাপক কাজী আকরম হোসেন।

যাবতীয় ইলেকট্রনিকস, অটোমেটিক এবং ট্রানজিস্টার ঘড়ি বিক্রি ও মেরামতের একমাত্র নির্ভরযোগ্য অভিজাত প্রতিষ্ঠান।
নূর ওয়াচ
NOOR WATCH
১৩৬/এ, বিপণি বিতান (দোতলা)
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
ফোন ঃ ২২৪৩৮৯